Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-XI, Special Issue, June 2023, Page No.14-18
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের অনুভবে রবীন্দ্রনাথ

ড. মহাশ্বেতা চ্যাটার্জি
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, পাঁচমুড়া মহাবিদ্যালয়, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
Shakti chattopadhyay, a very famous poets in Bengali literature. He Always made a strong opinion, specially in literature fields. In my article I want to enculcate, a strong view of Shakti chattopadhyay about Rabindranath Tagore's creations. Very distractingly poet Shakti place his opinion in Rabindranath's novel, drama, Articles and songs also. We also focusing, how a poet reaches other creators' creations respectively in proper manners. But Shakti chattopadhyay always placed his very own views. It was strictly based on his personal thinking and thoughts.

Keywords: Creation, literature, Cultural aspects, Social structure, Amalgamation.

"কখনো সমুদ্রে তাঁকে করেছি সন্ধান
কখনো পাথরে
কখনো হেমন্তে শান্ত মানসিক ঝড়ে
বৃষ্টিতে খরায় ফুলে শিকড়ে কখনো
কে যেন বলেছে; দেখো, শোনো –
কিছুই বলো না তুমি এক পা বাড়িয়ে
যে যেখানে আছে থাক, শিকড় নাড়িয়ে
তোলার সরল কাজ তোমার তো নয়!
তুমি শুধু করে যাবে প্রবৃত্তি সঞ্চয়
আর বাকি
তোমাকে যা ছোঁবে না, তা ফাঁকি।
কখনো সমুদ্রে তাঁকে করেছি সন্ধান
কখনো পাথরে
কখনো হেমন্তের শান্ত মানসিক ঝড়ে।"

'তাঁকে'/ শক্তি চট্টোপাধ্যায়

'জীবনমরণের সীমানা' ছাড়িয়ে আজও হয়তো দাঁড়িয়ে থাকেন সেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।কখনো সখা, কখনো প্রাণেশ্বর, কখনো প্রাজ্ঞজন, কখনো অভিভাবক আবার কখনো একান্ত আপনার জন। আমাদের

চিরশান্তির নীড়'ই হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে আপামর বাঙালির চিন্তা, চেতনা, মনন যেন অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কোনোদিন মুখোমুখি সাক্ষাৎ ঘটেনি। আট, নয় বছরের ছোটো ছেলে; যখন কবি শক্তি, মাসির সঙ্গে সিনেমা দেখতে গিয়ে নিউজ রিলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুর ছবি দেখতে পেয়েছিলেন। কোনো এক অজ্ঞাত কারণে মৃত রবীন্দ্রনাথের ছবি দেখে হাপুসনয়নে কাঁদছিলেন তিনি। অথচ বালক শক্তির রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সেই ছোটোবেলায় কোনোরকম ধারণায় ছিল না। মৃত রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেই প্রথম পরিচিতি ঘটে কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের।

আসলে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জড়িয়ে থাকাটা কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের, খানিকটা আর- পাঁচজন সাধারণ মানুষের মতোই ছিল। কারণ তিনি তাঁর সান্নিধ্য লাভ করতে পারেননি।

আসলে শক্তি চট্টোপাধ্যায় সত্যের সঙ্গে বসত গড়েছিলেন। সত্য তা যত কঠিন অথবা কঠোর হোক না কেন তিনি তা প্রকাশ করে গেছেন। কলকাতা সহ পশ্চিমবঙ্গের নানান জায়গা জুড়েই রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন বেশ ঘটা করেই উদ্ যাপিত হয়ে থাকে। তাঁর বার বারই মনে হয়েছে এ যেন শুধুই বাইরের আড়ম্বর। রবীন্দ্রনাথের সত্য, সাহিত্য, ভাবধারার বিপরীতে হাঁটতে থাকা কিছু দেখানেপনাকে পরোক্ষে তিনি ধিক্কারই জানিয়েছেন। এত এত অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্যই হোল সস্তার জনপ্রিয়তা। অর্ধশিক্ষিত অথচ আনন্দপ্রিয় মানুষের কাছে রবীন্দ্র জন্মোৎসব মানেই মেলা, দেদার ফূর্তি। রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে যেন মুনাফাকামীরা ব্যবসা ফেঁদে বসেছেন। রবীন্দ্র জন্মদিনের সুযোগে তাঁর লেখা গ্রন্থের বিক্রয়ও হু হু করে বাড়ছে। শক্তি চট্টোপাধ্যায় ঠিক যে চিত্রটি দেখেছেন তাই-ই যেন হুবহু তুলে ধরেছেন।

> "থিয়েটার- সিনেমা- সার্কাস- ইস্কুল কলকাতায় এই ধরনের মেলা এক নতুন ও বিচিত্র স্বাদ আনে একথা অনস্বীকার্য। তবে সেই সঙ্গে একথাও আমরা স্বীকার করব যে, রবীন্দ্রনাথের ধ্যানের শুভ, সত্য ও সাহিত্যকে বাদ দিয়ে বা যথাসম্ভব নেপথ্যে রেখে রবীন্দ্রনাথের ভিতর থেকে ফূর্তিটুকু পরিবেশন করাই এই সব ব্যাপক অনুষ্ঠানের অধিকাংশের লক্ষ্য, কেননা জনসাধারণ, কেননা প্রতিযোগিতা।"[১]

তিনি নিজে যে সমস্ত রবীন্দ্র জন্মদিবসের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকেছেন সুযোগ বুঝে সেখানে শূন্য আড়ম্বরের প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন। মেলাতে পারছিলেন না কিছুতেই এত জাকজমকের মাঝে কোথাও যেন রবীন্দ্র জন্মদিবস পালন তার উদ্দেশ্যই হারিয়ে ফেলছিল, তা যেন তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। তাই তিনি রবীন্দ্র জয়ন্তী পালনের অনুষ্ঠান গুলিতে যোগদান করবেন কিনা এই প্রশ্নটি নিজের কাছেই উত্থাপিত করেন।গুরুত্ব হারিয়ে যাওয়া পঁচিশে বৈশাখের অনুষ্ঠানগুলি তাকে আর সেভাবে টানতে সক্ষম হয়নি।
'আধুনিক বাংলা কবিতা' গ্রন্থের ভূমিকা অংশে আবু সয়ীদ আইয়ুব লিখেছেন –

> "বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দুই দশকের কবিতা যে মোটের উপর রবীন্দ্রকাব্যেরই প্রতিধ্বনি এতে সন্দেহ করা চলে না, এবং আক্ষেপও করা যায় না যখন আমরা স্মরণ করি, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা বাঙলার মতন দীন সাহিত্যকে ঋদ্ধির কোন্ স্তরে নিয়ে এসেছে।"[২]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই বিরলতম প্রতিভাধরদের একজন, যাকে অস্বীকার করার ক্ষমতা কারোর নেই। তিনি যে সৃষ্টিপথ রচনা করে গেছেন তা শতাব্দীর পর শতাব্দী আপামর বাঙালির সাহিত্যচর্চার পথ নির্দেশক হিসেবেই সূচিত হবে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনেক কবিতায় শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের প্রিয়। কবিতার অমোঘ দর্শনেই যেন আটকে যায় কবি শক্তির চোখ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শেষ জীবনের লেখা কবিতাগুলির প্রতি কবি শক্তির অমোঘ টান রয়ে গেছে। তাঁর 'শেষ লেখা', 'শেষ কবিতা', 'তোমার সৃষ্টির পথ' প্রভৃতি কবিতাগুলি কবি শক্তির খুব প্রিয়। সহজ, সরল ভাষায় লেখা এই কবিতাগুলি কবি শক্তির হৃদয়ে অনন্য অনুভূতির সঞ্চার করে। রবীন্দ্রনাথের শেষের পর্যায়ে লেখা কবিতাগুলি অলংকার শূন্য অর্থাৎ একেবারেই বাহুল্য নেই বললেই চলে। অথচ কবিতাগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব আত্মদর্শন রয়ে গেছে। কবিতার অনুভবই হয়তো রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে লিখিয়ে নেয় সবটা। কবি রবীন্দ্রনাথের এই অমূল্য লেখা গুলিই যেন গোপনে শক্তির সঞ্চার করে থাকে।

রবীন্দ্রনাথের গানের প্রতি কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ছিল অমোঘ টান। রবীন্দ্রনাথকে তিনি ভালোবেসে ফেলেন ওঁনার গান শুনেই। হৃদয়ের একেবারে গভীরে প্রবেশে করে রবীন্দ্র সংগীত। কবি শক্তির নিজস্ব অনুভূতিরও সার্থক প্রকাশ ঘটে ওই রবীন্দ্র সংগীতের মধ্যে দিয়ে। 'মরি লো মরি', 'ঐ যে বাহিরে বেজেছে বাঁশি' প্রভৃতি গানের কথা এবং সুর এতটা নিখুঁত হয়ে দেখা দেয়, যেন সৃষ্টিকর্তা রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস ও চূড়ান্ত মগ্নতা নিয়েই গানগুলি সৃষ্টি করেছেন। রবীন্দ্র সৃষ্ট গানের মূর্ছনায় কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় যেন চিরবিহ্বল, চিরচঞ্চল। এ প্রসঙ্গে বিষ্ণু দে'র 'গান' কবিতার কয়েকটি ছত্র স্মরণ করা যেতে পারে।

"মালতী ঘোষাল তাঁর স্পষ্টস্বরে গাইলেন যখন এই
পরবাসে রবে কে এ পরবাসে
আজীবন দীর্ঘ পরবাস –
সেদিন দেশের সত্তা রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘশ্বাসে
সুরের সত্যের নিঃসংশয় উদার অক্ষরে
চিরতরে মূর্তি পেল থেকে-থেকে একা, ভিড়ে
আবৃত্তির বাণী।
রবীন্দ্রনাথের গান হ'য়ে গেল দেশ সারাদেশ
বিস্তৃত যন্ত্রণা নিজবাসভূমি এই পরবাস দেশ।
সেই থেকে একা-একা, ভিড়ে অনুকূল হাওয়া ডাকে
আমাকেও, পরবাসী চলে এসো ঘরে।"[৩]

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের অভিযোগও ছিল বিস্তর।রবীন্দ্রনাথ তাঁর মাকে নিয়ে কিছুই লেখেননি। কোনো এক অজ্ঞাত কারণে তাঁর যেকোনো লেখায় মাতৃস্থানীয় চরিত্র রয়েছে, কিন্তু সেই চরিত্র গুলি জীবন্ত হয়ে ওঠে নি বলেই কবি শক্তির মনে হয়েছে।

চির চেনা সেই কলকাতার প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথের লেখায় অনুপস্থিত রয়ে গেছে। তাঁর 'ছেলেবেলা'র স্মৃতিতে সেকেলে কলকাতার একটু আধটু বর্ণনা থাকলেও তা যেন সেই ছিটেফোঁটাই। কলকাতা, চরিত্র হিসেবে রবীন্দ্রনাথের লেখায় সেভাবে অর্থবহ না হয়ে ওঠাটাকে কবি শক্তির ত্রুটি বলেই মনে হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত নাটকগুলিকেও নাটক বলে মনে হয়নি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের। গুটিকয়েক আইডিয়াকেই নাটকের বিষয়বস্তু করেছেন বলে কবি শক্তির মনে হয়েছে।কেন জানিনা শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মনে হয়েছে রক্তমাংসের চরিত্রের উপস্থিতি রবীন্দ্র নাটকে নেই বললেই চলে। কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় মনে

করতেন- পাঠ্য হিসেবে রবীন্দ্র নাটক অসাধারণ অনুভূতি জাগিয়ে তুললেও অভিনীত হবার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলেই সন্দেহ থেকেই যায়। অর্থাৎ রবীন্দ্র নাটক উপস্থাপনের প্রায়োগিক দিকগুলি বেশ জটিল।কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় আরও মনে করেছেন, কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেন আইডিয়াকেই নাটকের ক্ষেত্রে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। নাটক যেহেতু দৃশ্য এবং শ্রাব্য মাধ্যম তাই ওঁর নাটক সকলকে সে অর্থে কাছে টেনে নিতে পারেননি বলেই কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় মনে করেছেন। কোথাও যেন রবীন্দ্রনাটকে 'কমপ্রোমাইজের' কথাই বেশি করে ধরা পড়েছে।

শক্তি চট্টোপাধ্যায় বেশ খোলাখুলি ভাবেই জানিয়েছেন- রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটক, গল্প কিংবা উপন্যাস সব ক্ষেত্রেই নিজস্ব জগৎ থেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি। সংলাপ নির্মাণের ক্ষেত্রেও সেই শ্লথ গতি পরিলক্ষিত হয়েছে। ঠাকুরবাড়ির আদপ, কায়দা, রীতি, আচার, আচরণ হয়তো কোনোকিছুকেই তিনি মন থেকে বিসর্জিত করতে পারেননি। বীরভূমের লালমাটির বুকে তিনি নেমে এসেছিলেন ঠিকই, কিন্তু কোথাও যেন একটা ব্যবধান থেকেই গিয়েছিল বলে কবি শক্তির মনে হয়েছে।

আসলে চিরকালই প্রাণখোলা মানুষ শক্তি চট্টোপাধ্যায় নিজের অনুভূতির অপলাপ তিনি কোনোদিনই ঘটাননি। যেটিকে সত্য বলে মনে হয়েছে তা তিনি অবলীলায় উপস্থাপিত করার চেষ্টা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখার গঠনমূলক সমালোচনা করাকে কোনোদিনই কবি শক্তির তাঁকে ছোটো করা বা অপমান করা বলে মনে হয়নি। শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথকে পুজো করলেই তাঁকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদান করা হচ্ছে বলেই শক্তির মনে হয়নি। প্রকৃত রবীন্দ্র অনুরাগীরা হয়তো রবীন্দ্রচর্চাতেই মনোনিবেশ করতে আগ্রহী।একটি ঘটনার দিকে আলোকপাত করলেই বোঝা যাবে কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় ঠিক কী চেয়েছেন।

> "একবার শান্তিনিকেতনে কিঙ্করদার সঙ্গে কিছুদিন ভহিলাম। ভালোই ছিলাম। সেই সময়ে উত্তরায়ণে ঢুকতে গিয়ে দেখি, একটা প্ল্যাকার্ডে লেখা 'জুতা খুলিয়া প্রবেশ করুন', দেখেই আমার সহ্য হল না। আমি লাথি মেরে ওই প্ল্যাকার্ডটি সরিয়ে দিলুম। তখন রবীন্দ্রভবনের অধ্যক্ষ ভবতোষ দত্ত মহাশয় ব্যস্ত হয়ে ছুটে এসে আমাকে বললেন, 'এটা কি করেছেন শক্তিবাবু'? আমি বললাম 'এটা কি মন্দির ? রবীন্দ্রনাথ কি দেবতা ? আমি বিশ্বাস করি মানুষে। তাই মন্দির হলেও মানুষের মন্দির।'"[৪]

শুধুমাত্র মিউজিয়াম করে বা তাঁকে দেবতার আসনে বসিয়ে রাখা উচিত নয় বলেই শক্তি মনে করেছিলেন। আসলে স্তাবকেরা তাঁকে 'গুরুদেব' করেই রাখতে চেয়েছেন এবং রবীন্দ্রনাথও হয়তো সেই গুরুদেব হয়েই রয়ে গেলেন।

একজন কবি এবং দক্ষ সংগঠক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ।উনি জানতেন উনি বিখ্যাত হবেনই। তাই হয়তো প্রতিটি কাজ তিনি গুরুত্ব দিয়ে করেছেন। কবি শক্তিও উল্লেখ করেছেন কম বয়সে রবীন্দ্রনাথ মাইকেল মধুসূদন দত্ত সম্পর্কে সমালোচনা করেছিলেন। পরবর্তীতে এই ভুল বুঝতে পেরে তিনি মধুসূদন সম্পর্কে সঠিক মূল্যায়ন করে গেছেন। সংশোধনও হয়তো জীবনেরই একটি অঙ্গ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো মানুষও তা উপলব্ধি করেছেন।আর সেই অনুভবটুকু নিয়েই চালিয়ে গেছেন সংশোধনের কাজটি।

শক্তি চট্টোপাধ্যায় মনে করতেন এদেশি বা বিদেশি যত জন কবির কবিতা আমরা পড়ি না কেন রবীন্দ্রনাথের মতো এমন বিস্তৃত অথচ সংহত কবির তুলনা মেলা ভার।

> "আমি যখন মদ্যপান করতে করতে নিজের মধ্যে চলে যাই, তখন রবীন্দ্রনাথের গান আমার ভিতর-বাহিরকে একাকার করে দিয়ে যায়। করতে থাকে। তখন গলার সবটুকু জোর ও উদারতা দিয়ে ওঁর গান গাইতে ইচ্ছে করে। গাই উপায় নেই।"[৫]

মৃতুদিনেই প্রথম সাক্ষাৎ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। কোনো এক অজানা কারণে রবীন্দ্রনাথকে যেখানে দাহ করা হয়েছিল সেই নিমতলা মহাশ্মশানে বারংবার ছুটে গিয়েছেন কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়। কবিগুরুর প্রাণপ্রিয় আশ্রম শান্তিনিকেতনেও ছুটে গেছেন শান্তির খোঁজে। শান্তিনিকেতনের আকাশ, বাতাস, প্রকৃতি হয়তো অমোঘ বন্ধনে বেঁধে ফেলেছিল শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে। সেই শান্তিনিকেতনেই তিনি প্রয়াত হন। সেই বাঙালির একান্ত, পরম আশ্রয়স্থল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এভাবেই হয়তো জুড়ে গেছেন কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়।

গ্রহণ বর্জনের সমস্ত হিসেব নিকেশকে একেবারে দূরে সরিয়ে দিয়ে কবি শক্তি যেন বলে ওঠেন 'উনি এসেই পড়েন উপায় নেই।' রবীন্দ্রনাথকে এড়ানো হয়তো সত্যিই সম্ভব নয়। কোথায় যে রবীন্দ্রনাথ নেই; বাংলা ও বাঙালির কাছে আজও সেই স্থান অনাবিষ্কৃতই থেকে গেছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের একান্ত সত্তার সঙ্গে মিশে যাওয়া এক অপার বিস্ময়, চিরপুরাতন অথচ নব-নবীন সেই রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু নেই। দৈহিক উপস্থিতির উর্ধে তাঁর বিচরণ, তাঁকে যেন প্রতি মুহূর্তে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছেন কবি শক্তি। যাঁর আবাসস্থল হৃদয়ে, যাঁকে হৃদয়ে ধারণ করেই প্রতিটি প্রহর চলাচল করেন, তাঁর না থাকাটাকে আমলও দিতে রাজি নন কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়। জীবন এবং মরণের গণ্ডিকে এক লহমায় মুছে ফেলে প্রকৃত সুহৃদ, অভিভাবক রবীন্দ্রনাথ হয়তো অনন্তকাল ধরেই দাঁড়িয়ে থাকেন। একান্ত নিজস্ব অভিজ্ঞতার দৃষ্টিতে কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দেখেছেন, এবং তাঁর সমস্ত হৃদয়-জাত অনুভূতিকে খোলামেলা ভঙ্গিতে উপস্থাপিত করেছেন; যা এককথায় অনবদ্য একথা অনস্বীকার্য।

তথ্যসূত্র:

১। চট্টোপাধ্যায় শক্তি, মীনাক্ষী চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.), আমার রবীন্দ্রনাথ, পরম্পরা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: ২০১২,পৃষ্ঠা ১৬-১৭।
২। আইয়ুব সয়ীদ আবু ও মুখোপাধ্যায় হীরেন্দ্রনাথ সম্পাদিত, আধুনিক বাংলা কবিতা, কবিতা ভবন, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিমিটেড, কলিকাতা, প্রথম সংস্করণ: জুলাই ১৯৪০, পৃষ্ঠা ভূমিকা অংশ দ্রষ্টব্য।
৩। দে বিষ্ণু, দে বিষ্ণু -র শ্রেষ্ঠ কবিতা , দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, অষ্টম সংস্করণ: ২০০৯, পৃষ্ঠা ১৪১।
৪। চট্টোপাধ্যায় শক্তি, চট্টোপাধ্যায় মীনাক্ষী (সম্পা.), আমার রবীন্দ্রনাথ, পরম্পরা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: ২০১২ ,পৃষ্ঠা ৩৮।
৫। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪০।